ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue-V, May, 2025, Page No. 1214-1222
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.05W.123

অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের সাংগঠনিক দিক

দিলীপ সরকার, *সহকারী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শ্রীপত সিং কলেজ, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 20.05.2025; Accepted: 28 .05.2025; Available online: 31.05.2025

Abstract

The word co-operative literally means collective or joint effort. When a number of people engage in an activity for the purpose of achieving a common goal, it is essentially a cooperative program. In this article, I want to show how the organizations that were inspired by the philosophy of Ramakrishna Vivekananda in the late 18th and mid-19th century, among the various programs adopted by them, the development of women was one of the programs- how they implemented that program. At the time when Sri Ramakrishna or Swami Vivekananda emerged as a guide, the trend of social reform in Bengal was at the forefront of the question of women's emancipation. Therefore, in order to resolve their helpless situation, the society developed anti-sati-burning movement, cohabitation consent movement, anti-child marriage movement and above all efforts to spread women's education. Raja Rammohan Roy and Ishwarchandra Vidyasagar who took a leading role in women's emancipation.

Keywords: cooperative, women's emancipation, social reform, Cohabitation, Philosophy of Ramakrishna

সমবায় শব্দের আক্ষরিক অর্থ সমষ্টিগত বা সম্মিলিত প্রয়াস। যখন কিছু সংখ্যক মানুষ একক লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে কোন কার্যে লিপ্ত হয় তাকেই মূলত সমবায়ভিত্তিক কর্মসূচী বলা যায়। আমি এই প্রবন্ধে দেখাতে চাইছি অষ্টাদশ শতকের শেষ ও ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে যে সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছিল, তাদের গৃহীত নানাবিধ কর্মসূচীর মধ্যে নারীজাতির উন্নতিসাধন ছিল অন্যতম কর্মসূচী-সেই কর্মসূচীকে কিভাবে তারা বাস্তবায়িত করেছিল। যে সময় শ্রীরামকৃষ্ণ বা স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে পথপ্রদর্শকের আর্বিভাব ঘটে সেসময় বাংলায় সমাজসংস্কারের প্রবাহ চলছিল, তার পুরোভাগে ছিল নারীমুক্তির প্রশ্নটি। তাই তাদের অসহায় অবস্থার নিরসনকল্পে সমাজে গড়ে উঠেছিল সতীদাহ বিরোধী আন্দোলন, সহবাস সম্মতি আন্দোলন, বাল্যবিবাহ বিরোধী আন্দোলন এবং সর্বোপরী নারীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা। নারীমুক্তির ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এছাড়া ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন, পন্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি, দূর্গামোহন দাস, শশীপদ ব্যানার্জী এবং ব্রাহ্মসমাজভুক্ত অনান্য ব্যক্তিরাও নারীমুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।

অন্যদিকে নারীমুক্তির ক্ষেত্রে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ একটু স্বতন্ত্র ছিল। তথাকথিত সমাজ সংস্কারকগণ পরিবার তথা সমাজে নারীর অবনমিত অবস্থার উন্নতিসাধনে নিয়োজিত করেছিলেন।কিন্তু নারী যে পুরুষের মতই সমাজের পরিচালিকা শক্তি হিসেবে নিজেদের উপস্থাপিত করতে পারে সে প্রত্যয় তাদের

ছিল না।তাঁদের মতে নারী পুরুষের অধীনেই থাকবে, হ্যা, তবে কিছু পরিমাণে তাদের শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে। এমনকি কেশবচন্দ্র সেন নারীদের পাঠক্রমে ন্যায়শাস্ত্র অর্ন্তভুক্ত করার ক্ষেত্রে তীব্র আপত্তি জানান। অর্থাৎ তথাকথিত সমাজসংস্কারকগণ নারী-পুরুষের সাম্যনীতির জয়গান করেননি।এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বক্তব্যের ভিত্তি ছিল "ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুং মানসী, ত্বং কুমার উত বা কুমারী" অর্থাৎ তুমি স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমি বালক আবার তুমিই বালিকা অর্থাৎ নারী পুরুষের মধ্যে কোন ভেদ নেই। অন্যদিকে বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ অনুযায়ী নারী হবে স্বাধীন, স্বতন্ত্র একমাত্র নিজার জাগ্রত চৈতন্যের অধীন, কারোর অধীন নয়। সেজন্য স্বামীজী তৎকালীন নারীসমস্যার সমাধানকল্পে পুরুষদের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছেন "আগে মেয়েদের শিক্ষা দাও, তারপর তারাই স্থির করবে তাদের জন্য কি ধরনের সংস্কার দরকার।"

নারীজাতির দুঃখদুর্দশা দূর করার জন্য ব্যক্তিগত প্রয়োজন যথেষ্ট ছিল না, প্রয়োজন ছিল সুপরিকল্পিত সংগঠনের। নারীমুক্তির আদর্শ প্রচার করেই শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ বা তাঁদের অনুগামীগণ সামাজিক দায়িত্ব সম্পাদন করেননি, তার পাশাপাশি তাঁরা বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান ও গড়ে তোলেন। যার মধ্যে কয়েকটি জনসেবার জন্যে, আবার কয়েকটি নারীমুক্তির কাজে মনোনিবেশ করেছে। যেহেতু ঊনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কার আন্দোলনে নারীমুক্তি ছিল অন্যতম চালিকা শক্তি, তাই আমি আমার প্রবন্ধে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উদ্যোগে নারীজাতির কল্যাণে যে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল সেদিকে আলোকপাত করতে চাই। এক্ষেত্রে আমি আমার সময়সীমা সীমাবদ্ধ রাখবো ঊনবিংশ শতকের শেষভাগ থেকে বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত। তাই সময়ের দিক থেকে যে প্রতিষ্ঠানটি প্রথম রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে গড়ে উঠেছিল তা হল সারদেশ্বরী আশ্রম (১৮৯৫)।

(১) সারদেশ্বরী আশ্রম:

নারীজাতির কল্যাণের উদ্দেশ্যে এবং শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারাকে রূপায়িত করতে জন্ম হয় এই সংগঠনের।নারীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস, আত্মমর্যাদা ও স্বনির্ভরশীলতার মনোভাব জাগাতে গৌরিমা (আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা) এই উদ্যোগ নেন যা সারদেশ্বরী আশ্রমরূপে স্বীকৃত। তাঁর মনে হয়েছিল উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে নারী আদর্শ গৃহলক্ষী হইতে পারে না,সন্তানকে সুশিক্ষা দিতে পারে না,কেবল দৈহিক বল নয়,আত্মিক বলের অভাবে অতি তুচ্ছ কারণে নারীকে সংসারের অনেক দুঃখ সহ্য করিতে হয়।শারীরিক অত্যাচার ও মানসিক আঘাত সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া নারী সময় সময় আত্মঘাতিনী পর্যন্ত হইয়া থাকে।

উনিশ শতকে শেষদিকে বাংলায় যখন স্ত্রীশিক্ষার প্রসার ঘটেছিল অন্যদিকে জাতিগঠন তথা জাতীয় আন্দোলনও শুরু হয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ মনে করেন প্রচলিত স্ত্রীশিক্ষায় পাশ্চাত্য প্রভাব প্রয়োজনের তুলনায় অধিক ছিল। বিশেষত ১৮৭৬ সালে অ্যানেট আক্রয়েড বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর অনেকে এই ধরনের বিজাতীয় শিক্ষাকে বিশেষ করে পুরুষ ও নারীর শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং প্রণালী এক হওয়াকে জাতীয় সত্তা এবং সংস্কৃতির পক্ষে হানিকর বলে ভাবতে শুরু করেছিলেন। 'নববিভাকর সাধারণী' মেয়েদের জন্য যে পাঠ্যসূচীর প্রস্তাব করেছিলেন তাতে চরিত্র গঠনের জন্য প্রাচীন ভারতের মহীয়সী নারীদের জীবনী পাঠ, ব্রতকথা, রামায়ন, মহাভারত, গীতা এবং গৃহকর্ম শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থাদি প্রাধান্য পায়। এই পরিবেশে মেয়েদের স্বদেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার উপযোগী জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন করলেন মাতাজী তপস্বিনী গঙ্গাবাঈ ১৮৯৩ সালে মহাকালী পাঠশালার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এর ঠিক দুবছর পরেই ঐ আশ্রমের প্রতিষ্ঠা হয়। তাতে প্রথমটির উদ্দেশ্য ছিল ধর্মীয় শিক্ষা,চরিত্র গঠন ও আদর্শ গৃহিণী গড়ে তোলা। কিন্তু সারদেশ্বরী আশ্রমের লক্ষ্য ছিল শিক্ষার সঙ্গে ব্রহ্মচারিণী সন্ন্যাসিনী গড়ে তোলা।

ক্ষুদ্র আকারেই প্রাথমিক ভাবে আশ্রমের সূচনা হয়। ২৫ জন আশ্রমবাসিনীকে নিয়ে গৌরিমা নারীজাতির উন্নতিসাধনের সংকল্পের সূচনা করেন। তিনি নিজে সকলকে শিক্ষা (বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মশিক্ষা) দিতেন। পরিণত বা বয়স্কদের ধর্মোপদেশ দান করতেন- এজন্য আশ্রমে বসবাস, আহার ও শিক্ষার বিনিময়ে তিনি কোন রূপ অর্থ গ্রহণ করতেন না। স্বাভাবিকভাবেই আশ্রমটির ব্যয়সংকুলানের নিমিত্ত স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সাহায্যের প্রয়োজন হয় এবং তিনি তা লাভও করেন। প্রথম কয়েক বৎসর নিতান্ত অর্থাভাবের মধ্যে আশ্রমটি কাজ চলেছিল, ধীরে ধীরে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ তাঁকে সাহায্য করেন। ২৪ পরগনার এক ধনী পরিবারের গৃহিনী অর্থসাহায্য করেন,

এছাড়া মুঙ্গেরের সিভিল সার্জেন রায় উপেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুরের স্ত্রী সরোজিনী দেবী এবং গৌরিমার গর্ভধারিনী গিরিবালা দেবীও নানাভাবে আশ্রমকে সাহায্য করেন। সহায়তার জন্য এগিয়ে আসেন তেওর জাতির মুচিরাম দাস, গগন জেলে, পূণ্যবাবু দারোগা, চন্দ্রনাথ নিয়োগী, মোহিত মুখোপাধ্যায়, বিপিন চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুরেন্দ্রনাথ সেন। কলকাতার প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার মাধবচন্দ্র রায়বাহাদুর একটি টাকার তোড়া এবং তাঁর স্ত্রী কেশবমোহিনী দেবী আশ্রমের চারিদিকে নিজ ব্যয়ে একটি প্রাচীর নির্মাণ করে দেন। স্বামী প্রেমানন্দ রান্নাঘরে সংস্কারের নিমিত্ত ২৫ টাকা দান করেন।

এই আশ্রমের সমাজকল্যাণমূলক কাজ প্রধানত চার ভাগে বিভক্ত ছিল- (ক) স্ত্রীশিক্ষা প্রচার (খ) শিক্ষিকামন্ডলী গঠন (গ) দরিদ্র মেয়েদের এবং বিধবাদের সাহায্য (ঘ) মেয়েদের জীবন ও জীবিকার উপায় সন্ধানে সহযোগিতা করা। তাঁর বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত। ইংরেজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থাও এই বিদ্যালয়ে ছিল। পুঁথিগত বিদ্যার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক শিক্ষা যেমন তাঁত বোনা, সেলাই ও অনান্য শিল্পকর্ম পাঠ্যসূচীর অর্ন্তভুক্ত ছিল। আশ্রমের যাবতীয় কার্যাবলী রন্ধনাদি, পূজাপাঠ থেকে হিসাব লিখন সকল প্রকার কাজই ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে বয়স ও সামর্থ্য অনুযায়ী সকল শিক্ষার্থিনী ও শিক্ষয়িত্রীকে করতে হত। এই ধরনের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরবর্তীকালে জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করত।

বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন গৌরীমা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে কলকাতার জনমন্ডলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সমন্ধ রাখতে না পারলে তাঁর নারীশিক্ষা এবং আদর্শ নারীগঠনের কাজ প্রসারতা লাভ করবে না। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে কলকাতায় যে মাতৃসভা আহুত হয় সেখানে শ্রোতৃমন্ডলীকে নারীকল্যাণে আত্মনিয়োগ করার জন্য গৌরীমা উদ্বুদ্ধ করেন। ক্রমে মহেন্দ্রনাথ শ্রীমানীর অর্থানুকূল্যে বিদ্যালয়ের জন্য গাড়ী ও ঘোড়া কেনা হয়। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯২৪) প্রথম পরামর্শ সভা গঠিত হয়, শিক্ষিত হিন্দু মহিলাদের নিয়ে একটি মহিলাসমিতি গঠন করা হয়; কয়েকজন মহিলাকে নিয়ে কার্যনির্বাহক সমিতিও সংগঠিত হয়। আশ্রমের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তিনি কিছু দায়িত্ব ব্রহ্মচারিণীদের মধ্যে বন্টন করে দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল নারীজাতির কল্যাণসাধনে উৎস্বর্গিতপ্রাণা কিছু আদর্শ চরিত্রের ব্রহ্মচারিণী গঠন করা যাঁরা অপর মেয়েদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করতে পারবেন। এই শিক্ষয়িত্রীদের ভবিষ্যতে সন্ন্যাস দেওয়া তাঁর লক্ষ্য ছিল। তিনি সেই উদ্দেশ্যে মাতৃসঙ্ঘ স্থাপন করেন এবং স্বয়ং এই সঙ্ঘের পরিচালিকা ও সভানেত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

ক্রমে ধনী দরিদ্র সমাজের সকল স্তরে শিক্ষার্থীদের কাছে এই প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তাই আশ্রমের কার্যপ্রণালীর প্রসারকল্পে শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনও অনূভুত হয়। এর ফলস্বরূপ ১৯৪২ সালে নবদ্বীপে ও ১৯৪৭ সালে বিহারের গিরিডিতে আশ্রমের দুটি শাখাকেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৯৫ সালে ৭ই জানুয়ারী আশ্রমটির শতবর্ষপূর্তি উৎসবের সমাপ্তি অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল কে. ভি. রঘুনাথ রেড্ডি একশো বছর ধরে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দিয়ে কাজ করে যাওয়ার জন্য আশ্রমকে অভিনন্দন জানান। এভাবে আশ্রমটি একাধারে শিক্ষার্থিনী ও সন্ন্যাসিনী প্রস্তুত করে চলেছে।

(২) রামকৃষ্ণ মিশন নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়:

১৮৯৮ সালে ১৩ই নভেম্বর শ্রীশ্রীমার কালীপূজার দিনে যোগীনমা, গোলাপ মা, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী সারদানন্দের উপস্থিতিতে কলকাতার বাগবাজারে (১৬ নং বোসপাড়া লেন) শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালীন পূজা করে বালিকাদের শিক্ষার জন্য নিবেদিতা পরিচালিত বিদ্যালয়ের সূচনা করেন। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ১৮৯৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের কাজ ছিল পরীক্ষণমূলক।

বিদ্যালয়ের ভবিষ্যত সাফল্য সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত্ত হন। অত: পর অর্থের প্রয়োজনে তিনি বিদেশযাত্রা স্থির করেন। ১৮৯৯ এর জুলাই থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত বিদ্যালয় সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল। ১৯০২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংল্যান্ড আমেরিকা থেকে ফিরে এসে নিবেদিতা আবার বিদ্যালয়ের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে তিনি কিন্ডারগার্ডেন পদ্ধতিতে শিক্ষা দিতে শুরু করেন। এসময় দৈনন্দিন কার্যতালিকায় পড়াশোনা অপেক্ষা সেলাই ও খেলাধূলা ছিল প্রধান।

নিবেদিতা ১৯০২ সালের নভেম্বরে নিজের গৃহে কথকতা ও চন্ডীপাঠের ব্যবস্থা করেন।সেই সুবাদে অন্তঃপুরের নারীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও সৌহাদ্য স্থাপিত হয়। সিস্টার ক্রিস্টিন ১৯০৩ সালের এপ্রিল

মাসে নিবেদিতার সাথে যোগদান করায় বয়স্ক মহিলাদের জন্য 'পুরস্ত্রী বিভাগ'টি সামান্য ভাবে হলেও আরম্ভ করা সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে ১৯০৪ সালে জগদ্ধাত্রী পূজার দিন বিকালে স্বতন্ত্র বিদ্যালয় রূপে 'পুরস্ত্রী বিভাগ'টির সূচনা হয়। বিভাগটি সম্পূর্ণভাবে ভগিনী ক্রিস্টিনের পরিচালনাধীন ছিল।

নিবেদিতা ও ক্রিস্টিনের আন্তরিকতা ও আগ্রহ বাস্তবিকই তৎকালীন গোঁড়া সমাজের সকল বাধা দূর করেছিল। ধীরে ধীরে রক্ষণশীল পরিবারের কন্যা ও বধূগণ বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। পর্দাপ্রথা অক্ষুন্ন রেখে তাদের বিদ্যালয়ে যাতায়াতের জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়। কয়েকজন সহৃদয় ব্যক্তির আনুকূল্যে দুটি ঘোড়ার গাড়ি সংগৃহীত হয়। বিদ্যালয় বসত তিনবার-সকাল আটটা, দুপুর এগারোটা ও বিকেল চারটে, প্রথম পর্বে শিশুদের পাঠশালা বসত এবং পরের দুই অধিবেশনে পুরস্ত্রীগণ নিজেদের সুবিধামত আসতেন। প্রথম থেকেই এর সমস্ত ব্যয়ভার বহন করে আমেরিকার বোস্টন শহরের অধিবাসিনী মিসেস ওলি বুল। স্বামীজী তাঁকে 'ধীরামাতা' বলে সম্বোধন করতেন।

নিবেদিতা লিখেছেন

> "অতীতের হিন্দু নারীগণ কি আমাদের লজ্জার কারণ ছিলেন, যে তাঁদের লাবণ্য, মাধুর্য, নম্রতা ও ধর্মভাব, সহিষ্ণুতা ও শিশুসুলভ গভীর ভালোবাসা এবং করুণা প্রভৃতি প্রাচীন আদর্শ বর্জন করে আমরা পাশ্চাত্য নারীর বিবিধ তথ্যসংগ্রহ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লাভের দুর্বার আগ্রহ- যা পাশ্চাত্য শিক্ষার অসংস্কৃত ফলমাত্র - তাই গ্রহণে ব্যগ্র হব?"

তবে একথা মনে করা ভুল হবে যে নিবেদিতা অগ্রগতির বিরোধী ছিলেন। তিনি বলতেন পুরাতন প্রথার মধ্যে মেয়েরা কেবল শৃঙ্খলা নয়, জীবনের উদ্দেশ্য লাভ করেছে। কিন্তু তিনি জানতেন ভারতীয় সমাজে যে পরিবর্তনের সৃষ্টি হয়েছে তাকে উপেক্ষা করে পুরাতন প্রথা বজায় রাখা সম্ভব নয়। প্রগতির স্রোত তখন রক্ষণশীল পরিবারে ক্রমবর্ধমান। তাই বিধবা ও বিবাহিতা মেয়েদের বাংলা সাহিত্য ও সূচীশিল্প শিক্ষার সাথে ইংরেজি শিক্ষার ব্যবস্থাও করেন।নিবেদিতার বিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে যাঁরা শিক্ষকতা করার সুযোগ লাভ করেন, তাঁদের মধ্যে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী শ্রীমতি লাবণ্যপ্রভা বসু এবং পরে পুস্প দেবী, মহামায়া দেবী, বিপিনচন্দ্র পালের কন্যা অমিয়া দেবী, লেডি অবলা বসু এবং সরলাবালা সরকারের নাম উল্লেখ করা যায়।

১৯১১ সালে ভগিনী নিবেদিতার আকস্মিক দেহত্যাগে বিদ্যালয়ের ভবিষ্যত সমন্ধে সকলেই হতাশ হয়ে পড়েন। ইতিপূর্বে ১৮ই জানুয়ারী, ১৯১১ সালে মিসেস ওলি বুলের মৃত্যুতে বিদ্যালয়ের আর্থিক অনিশ্চয়তা তৈরী হয়। এই সংকট মুহূর্তে ভগিনী ক্রিস্টিন দৃঢ় হস্তে বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং ভগিনী সুধীরা তাঁকে এ কাজে সাহায্য করেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ঘটলে তিনি আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করলে সুধীরা দেবী সর্বতোভাবে বিদ্যালয় পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

ভগিনী নিবেদিতার মৃত্যুর পর ১৯১৩ সালে মার্চ মাসে টাউন হলে এক স্মরণসভা আহুত হয় মূলত জনগনের সাহায্য লাভের উদ্দেশ্যে। কিন্তু ১৯১৩ সাল পর্যন্ত সন্তোষজনকভাবে কোন সাহায্য সংগৃহীত হয়নি। এই বিষয়টি ১৯১৩ সালের ৯ই জুন অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগে তুলে ধরা হয় এবং বলা হয় স্মরণসভার আহ্বানের পর কুড়ি মাস অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও যেটুকু পরিমাণ অর্থ সংগৃহীত হয়েছে তা হল ৯৩২-৭-৯। আরো বলা হয় যে বিদ্যালয়টি- decidedly one of very few institutions, if not the only institution of its kind, that has real access to Hindu middle- class ladies behind the purdah and that imparts education on thoroughly oriental. এই পত্রিকার ১৩ই জুন আরেকটি সম্পাদকীয় বিভাগে বলা হয় Dr. Mrs. Jagadish Chandra Bose had donated 500/- to the school. Both Dr. Rashbehari Ghosh and Mr. C.C. Ghosh were also ready to pay their promised subscription as soon as a responsible committee had been formed to manage the school.

বাস্তবিক নিবেদিতার দেহত্যাগের পর ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণ মিশনের জনৈক ভক্তের এককালীন অর্থ প্রদান এবং মিসেস বুলের ইচ্ছা অনুসারে ইজি. থর্প প্রেরিত মাসিক দুইশত টাকার সাহায্যে বিদ্যালয় কিছুটা আর্থিক সংকটমুক্ত হয়। স্বামী সারদানন্দ 'পুরস্ত্রী শিক্ষা ও বিদ্যালয়ের কার্যবিবরণী' তে লিখেছেন -ভগিনী নিবেদিতার মহান আত্মত্যাগ কেন্দ্র রূপে পরিণত হইয়া আপনার চতুপার্শ্বে কতকগুলি আত্মত্যাগিনী শিক্ষয়িত্রীর সমাবেশ

ঘটিয়াছে, এ সমাবেশই যেন প্রতিষ্ঠানটির স্থায়ী মুলাবোধ- ইহার বিস্তার ও উন্নতির অব্যর্থ প্রতিভূস্বরূপ এবং এই মহৎ কার্য বর্ধিষ্ণু হইয়া বৃক্ষলতাদির মত চারিদিকে মঞ্জুরিত ও পল্লবিত হইয়া ফুটিতে চেষ্টা করিতেছে।

(৩) মাতৃমন্দির:

সুধীরা দেবী ১৮৮৮ সালে উত্তর কলকাতার জন্মগ্রহন করেন। তাঁর মধ্যে প্রথমে দেশাত্মবোধ ও পরে আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি যে আগ্রহ দেখা যায় তার পশ্চাতে ছিল তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। প্রথমে বিপ্লবী ও পরবর্তী জীবনে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী স্বামী প্রজ্ঞানন্দ (দেবব্রত বসু) প্রেরণা ও উৎসাহ। ১৯০৬ সালে তিনি নিবেদিতা বিদ্যালয়ে কর্মী রূপে যোগদান করেন।[১৮] ১৯১২ সালে সম্পূর্ণ রূপে গৃহত্যাগ করে তিনি বিদ্যালয়ের কার্যভার গ্রহণ করেন। এই সময় তিনি সংসারে অনাগ্রহী বয়স্কা মহিলাদের নিয়ে স্বামী সারদানন্দের সহায়তায় স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ অনুযায়ী 'মাতৃমন্দির' নাম দিয়ে একটি আশ্রম বিভাগ স্থাপন করেন। ১৯২০ সালে শ্রীমায়ের মহাপ্রয়ানের পর এটি 'সারদা মন্দির' নামে পরিচিত হয়। ক্রমে মাতৃমন্দিরের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

স্বামী বিবেকানন্দ অনুভব করেছিলেন দেশের কল্যাণ সাধনে একটি প্রচারিকা সজ্ঘ গঠনের প্রয়োজন। স্বামীজীর এই সম্মিলিত কাজকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে এসেছিলেন ভগিনী সুখীরা। সারদা দেবীর প্রয়াণের পর মাতৃমন্দির 'সারদামন্দির' নামে পরিচিত হয়। স্থানাভাবে বিদ্যালয়ের মেয়েরা বিভিন্ন ভাড়াবাড়িতে গিয়ে নানারকম অসুবিধার মধ্যে কাজ করতেন দেখে সারদা দেবী বলেছিলেন: আমার মেয়েরা ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে,ওদের একটা বসবার জায়গা হলে ভালো হয়।ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াও ১৭ নং বোসপাড়া লেনে স্থানাভাব লক্ষ্য করা যায়। এই কারণে বেলুড় মঠের ট্রাস্টিরা বিদ্যালয়ের প্রয়োজন অনুভব করেন। সেই উদ্দেশ্যে ১৯১৭ সালে বোসপাড়া লেনে একখন্ড জমি ক্রয় করা হয়।[২০] ১৯১৮ সালে প্রতিষ্ঠানটি রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র রূপে গৃহীত হয়। ১৯১৬-১৮ সালে বার্ষিক বিবরণীতে জানা যায় প্রতিষ্ঠানটির স্বতন্ত্র তিনটি বিভাগ ছিল: (১) নিবেদিতা বিদ্যালয় (২) বিবেকানন্দ পুরস্ত্রী বিভাগ এবং (৩) মাতৃমন্দির ১৯১৪-১৫ সালের বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণীতে সুধীরার কর্মকুশলতা ও শিক্ষকতার প্রশংসা করা হয়। তাতে বলা হয়।

অন্ত:পুরচারিণীদের বিভাগে ৩৭ জন শিক্ষালাভ করিতেছে। অন্ত:পুরচারিণীদের বিভাগে দুইটি প্রধান শ্রেণীভাগ রহিয়াছে। প্রথমে একটি শ্রেণীতে বর্ত্তমানে স্ত্রীলোকদিগের বিশেষভাবে শিক্ষণীয় 'সকল বিষয়ই শিক্ষা দেওয়া হয়' এবং দ্বিতীয় অংশে ঐ সকল বিষয় ব্যতীত যাঁহারা শিক্ষাদানকার্যে নিপুণতা লাভ করতে চাহেন, তাঁহাদের সে কার্য্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। এই শেষোক্ত বিভাগে বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজী, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্কশাস্ত্র, জীবনবিদ্যা, চিত্রবিদ্যা প্রভৃতি ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে শিক্ষাদান কার্য্য ও প্রতি শনিবার শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থিনীকে প্রতিদিন দুইঘন্টা বা ততোধিক কাল বালিকা বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে শিক্ষকতা করাইয়া শিক্ষাদানকার্য্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে দেওয়া হয়।অন্ত:পুরচারিণীদের শিক্ষাকার্য্যে প্রথম বিভাগে ১৪ জন বিধবা ও ৬ জন সধবা স্ত্রীলোক আছেন; ইহাদের অভিভাবকগণ সকলেই ইহাদের শিক্ষালাভে উৎসাহ প্রকাশ করিয়া থাকেন।দ্বিতীয় বিভাগে ১৭ জন মহিলা শিক্ষকতা ও বিদ্যালয় পরিচালন কার্য্যে যোগ্যতা লাভ করিতেছিলেন। ইহাদের মধ্যে ১৩ জন সিস্টার ক্রিস্টিনের প্রধান সহায়তাকারিণী শ্রীমতি সুধীরার নেতৃত্বে সমগ্র বালিকা বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কার্য্য চালাইয়া দিতেছেন। প্রসঙ্গত আমরা জ্ঞাপন করিতে চাই যে উক্ত ১৭ জন শিক্ষার্থিনীর মধ্যে সপ্তদশবর্ষীয়া একটি কুমারীকে তাহার অতি দরিদ্র পিতামাতা ইচ্ছানুরূপ পাত্রস্থ করিতে না পারায় গত দুই বৎসর হইল শ্রীমতি সুধীরা তাঁহাকে শিক্ষাদানরূপ মহৎ ব্রতের দীক্ষিত করিয়া লইয়াছেন। এই বিভাগে সেলাই কার্য্যে তিনটি বর্ষীয়সী মহিলা শিক্ষার্থিনী হইয়া যোগদান করিয়াছেন।

১৯১৬-১৮ সালের বার্ষিক বিবরণীতে এই মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। এগুলি ছিল নিম্নরূপ: -

(১ম) শিক্ষা ও সেবাব্রতে যাহারা জীবন উৎস্বর্গ করিয়াছেন এইরূপ হিন্দু রমনীগণের বাসভবন রূপে ইহা প্রধানত পরিগণিত হইবে।

(২য়) পূর্বোক্ত ব্রতদ্বয় ধারণে অভিলাষিণী হইয়া যে সকল হিন্দু রমণীর উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করিতে চাহেন, আশ্রম তাঁহাদিগকে নিজ করে রাখিয়া ঔই উচ্চাদর্শে জীবন গঠন করিবার এবং শিক্ষাদান ও সেবা

করিবার বর্তমানকালের প্রকৃষ্ট জীবন প্রণালীর সকল শিখিবার সুবিধা বিধান করিবে।

(৩য়) কলিকাতায় থাকিবার সুবিধা না থাকায় দূরবর্তী স্থানের যে সকল ছাত্রী সিস্টার কৃষ্টিনা পরিচালিত বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভের অভিলাষিণী হইয়াও আশা পূরণ করিতে পাইতেছে না, মাসিক খরচা লইয়া আশ্রম তাহাদিগের ঐ বিষয়ে সুযোগ করিয়া দিবে।

(৪র্থ) সীবন বিদ্যা, সূচী শিল্প প্রভৃতি শিখাইয়া এবং লেখাপড়া জানিলে ভদ্রপরিবারে পড়াইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, আশ্রম অসহায়া দরিদ্রা পুরস্ত্রীদিগকে জীবিকানির্ব্বাহে সহায়তা বিধান করিবে।

১৯১৫ থেকে **১৯১৮** সাল পর্যন্ত এই মাতৃমন্দিরের ছাত্রীসংখ্যা এবং **১৯১৬-১৮** পর্যন্ত সীবন ও সূচীশিল্প দ্বারা যা আয় হয়েছে তা নিম্নে দেওয়া হল: -

ছাত্রীসংখ্যা:

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে	-	**১১** জন
১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে	-	**১৬** জন
১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে	-	**২৩** জন
১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে	-	**৩২** জন

সীবন ও সুচীশিল্প দ্বারা আয়:

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে	-	**১১৮** টাকা
১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে	-	**২৫০** টাকা
১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে	-	**৩২১** টাকা

মন্দির পরিচালিকা ও নিবাসিনীগণের উপার্জিত অর্থ দ্বারা মন্দিরের ব্যয় নির্বাহ করা ছাড়া দরিদ্রকে বস্ত্রদান এবং দুজন অসহায় বালকের স্কুলের বেতন ও পুস্তক ক্রয় করা হয়েছিল। এ যেন নিবেদিতার সেবার আদর্শের বাস্তবায়িত রূপ। 'মাতৃমন্দির' সকলের প্রচেষ্টা ও উদ্যমেই পরিচালিত হতে থাকে। যেমন শ্রীশ্রীমা একবার সুধীরার প্রসঙ্গে বলেন 'যখন খরচ চলে না, বড়লোকে মেয়েদের গানবাজনা শিখিয়ে মাসে ৪০/৫০ টাকা ও তাহার সহচারিণীগণ ভদ্র পরিবারের ছাত্রী পড়াইয়া এবং বয়ন, সীবন, সূচীশিল্প প্রভৃতি নানা উপায়ে অর্থউপার্জনক্ষম আপনারাই বহন করিতেছিল।.... অতএব সাবলম্বন ও পরার্থে ত্যাগি যে ইহাদের জীবনের মূলমন্ত্র তাহা আর বলিতে হইবে না। নারীজাতির শিক্ষা ও সাহায্যের জন্য মূলত এই সারদামন্দিরের প্রতিষ্ঠা।তবে তাহার ভিত্তি ছিল আধ্যাত্মিক জীবন যেখানে মেয়েরা হয়ে উঠবে স্বাধীন ও সাবলম্বী।

এই পর্বে শুধুমাত্র যে মাতৃমন্দিরের উন্নতি হয়, তা নয় নিবেদিতা বিদ্যালয়ে ক্রমপ্রসার ও সম্ভব হয়েছিল। **১৯১৯- ২২** খ্রী: বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণী থেকে জানা যায় এই পর্বে বিদ্যালয় ও পুরস্ত্রী বিভাগের ছাত্রী সংখ্যা ২৪৫ জন এবং তাহাদের দৈনিক উপস্থিতি গড়পড়তায় ২০০ জন ছিল। এই সময় ৯ জন শিক্ষয়িত্রী বিনা পারিশ্রমিকে কার্য করতেন। এই রিপোর্টেই ভগিনী সুধীরার প্রসঙ্গে বলা হয়,

> "ভগিনী ক্রিস্টিনার আমেরিকা প্রত্যাবর্তনের পর হইতে বিদ্যালয়ের কার্য্য বিভিন্ন প্রণালীতে নানা নতুন শাখাপ্রশাখার বিভক্ত হইয়া দ্রুতগতিতে বাড়িয়া উঠিতেছিল ... **১৯১৭** খ্রীষ্টাব্দে কাশী, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সংশ্লিষ্ট একটি নতুন শাখা বিদ্যালয়ের পত্তন করেন ... **১৯১৯** খ্রীষ্টাব্দে পূর্ববঙ্গের কুমিল্লা শহরে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের ঐরূপ আরেকটি শাখা স্থাপন ও তাঁহারই চেষ্টার ফলস্বরূপ।"

(৪) সারদা বিদ্যালয় (মাদ্রাজ):

১৯১২ সালে মাদ্রাজের ইগমোরে ভগিনী সুব্বালক্ষী ও তাঁর মাসি ভালাম্বাল আম্মাল এই দুই বালবিধবা আরো চারজন বিধবাকে নিয়ে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিধবা আশ্রম ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়। **১৯২৭** সালে ভগিনী সুব্বালক্ষী সারদা লেডিজ ইউনিয়ন গঠন করেন এবং সেই বছরেই তিনি বারোজন বিধবাকে নিয়ে মাদ্রাজের ত্রিপ্লিকেনে একটি ভাড়াবাড়িতে বিদ্যালয়ের সূচনা করেন।এখানে মেয়েরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা হবার মত প্রশিক্ষণ পেত। বিদ্যালয়টির মাধ্যমে ছাত্রীরা যাতে নিজেদের জীবনধারনের প্রয়োজনীয় অর্থ উপার্জন করতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হত। বিদ্যালয়ের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির সাথে সাথে এটি শহরে বিভিন্ন

ভাড়াবাড়িতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ১৯৩৮ সালে ভগিনী সুব্বালক্ষী বিদ্যালয়টিকে রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে যুক্ত করার আবেদন জানান। শেষপর্যন্ত ১৯৩৮ সালে মিশন কর্তৃপক্ষ এই বিদ্যালয়ের নাম ও আদর্শ অক্ষুন্ন রেখে এর পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে বিদ্যালয়ের পরিধি আরো সম্প্রসারিত হয়। এরপর এই প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়টির তিনটি বিভাগের সূচনা ঘটে - ক. Higher Elementary Senior খ. Junior এবং গ. Preparatory মহালক্ষ্মী স্ট্রীটে আদর্শ Elementary বিদ্যালয়টি প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় রূপে পরিচিত হয়। এর পাশাপাশি সভার পরিচালনায় Elementary বিদ্যালয়টি চলতে থাকে।ছাত্র বিদ্যালয় থেকে ছাত্রীর অংশটিকে আলাদা করে ১৯৪০ সালে সারদা মিশনের অধীনস্থ করা হয়।

(৫) মাতৃমন্দির (মাদ্রাজ):

ব্যাঙ্গালোরে ভেঙ্কটরমন নামে একজন ভদ্রলোক স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর দুই কন্যা শিক্ষার ভার নিতেন ভগিনী নিবেদিতাকে অনুরোধ করেন।এর উত্তরে ভগিনী সুধীরা (২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১০) লেখেন -এরকম মেয়েদের এখানে থাকার জন্য প্রয়োজন শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর বাড়ির লাগোয়া একটি বাড়ি ও আরেকজন রক্ষণশীল হিন্দু মহিলা, যাঁর তত্ত্বধানে তারা থাকবে।

১৯১১ সালে সারদা দেবী দক্ষিণভারত ভ্রমণকালে ব্যাঙ্গালোরে উপস্থিত হন। সেখানে ভেঙ্কটরমন সকন্যা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং তাঁর কন্যাদের শ্রী শ্রী সারদা মায়ের তত্ত্বধানে রাখার অনুরোধ জানান। ঐ দুইজন মেয়েকে কেন্দ্র করে মাদ্রাজে 'সারদা মাতৃমন্দির' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। দক্ষিণভারতে ভবিষ্যতে একটি পূর্ণাঙ্গ মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্বামী সর্বানন্দ ঐ দুইকন্যাকে আধ্যাত্মিক শিক্ষাদান মনস্থ করেন।এজন্য রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি কন্যাদ্বয়কে কলকাতায় প্রেরণের অনুমতি চান।তাঁর নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর মিশন কর্তৃপক্ষের অনুমতি এলে (অক্টোবর, ১৯১৭) দুইবোন প্রায় চারবছর কলকাতায় শ্রীমায়ের কাছে থেকে আধ্যাত্মিক শিক্ষা লাভ করে।

(৬) মহিলা হাসপাতাল (বারাণসী):

কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ ভগিনী নিবেদিতা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা ভগিনী সুধীরাকে একদিন প্রশ্ন করেন, সুধীরা এখানে সেবাশ্রমে ছেলেরা রুগিনীদের সেবা করেন। সেকাজের জন্য তুমি একটি মেয়ে পাঠাতে পার না?" এই প্রস্তাবেই কাশী সেবাশ্রমের পৃথক মহিলা হাসপাতালের অঙ্কুর নিহিত ছিল।১৯১৪ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে সুধীরা, সরলা নামক বিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকে ডাফরিন স্কুলে ধাত্রীবিদ্যা প্রশিক্ষণের জন্য ভর্তি করেন। ১৯১৭ সালে পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয় এবং সরলা তাতে প্রথম স্থান অধিকার করে।

১৯১৯ সালে ভগিনী সুধীরা সরলাকে কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে নিয়ে যান মূলত মহিলা রুগীদের সেবা করা এবং কয়েকটি মেয়েকে (বিশেষত বিশ্বেশ্বরী নামক মেয়েটিকে) অসুস্থের শুশ্রুষা করার উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য। আবার শ্রীমার জীবনের অন্তিম দিনগুলিতে এবং মায়ের ভ্রাতুস্পুত্রী রাধুর সন্তান সম্ভাবনাকালীন সময়ে সেবার ভার তিনি স্বয়ং নেন। সুতরাং সরলা নামক এই মেয়েটির শিক্ষা সেসময় যথেষ্ট উপযোগী ছিল । ১৯৪৮ সালে রামকৃষ্ণ মিশনকর্তৃপক্ষ বারাণসী হাসপাতালের সম্পূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব নিলেও মহিলা বিভাগের আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ছিল পুরোপুরি মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত।

১৯৩১ সালে সরলা এবং প্রফুল্লমুখী দেবী কাশীতে 'সারদা কুটির'স্থাপন করেন,যাতে এরপর থেকে তাঁরা সেখানে স্বাধীনভাবে থাকতে পারেন অর্থাৎ এটি ছিল স্ত্রীমঠের নামান্তর। এই 'সারদা কুটির' নির্মাণের কৃতিত্ব একান্তই সরলার এবং প্রফুল্লমুখীর (নিবেদিতা বিদ্যালয়ের আরেক ছাত্রী)। কারণ সারদা কুটির নির্মাণে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ছিল তা এসেছিল মূলত সরলার মাধ্যমে।কলকাতা থাকাকালীন শরৎ মহারাজ তাঁকে ভক্তদের বাড়িতে সেবার নিমিত্ত পাঠাতেন, এর বিনিময়ে ভক্তরা যে পরিমাণ অর্থ দেন তা দিয়ে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতেন এবং সঞ্চয়ও করতেন।এই সঞ্চিত অর্থ দিয়েই 'সারদা কুটির' স্থাপন।

মূল্যায়ন:

তৎকালীন সমাজ সংস্কারকদের মত নারীজাতির উন্নতিকল্পে কোন সংস্কার প্রর্বতন বা মহিলাদের ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট মতামত ব্যক্ত না করলেও নারীর সামাজিক অবস্থানের একটি ধারণা দেন যেমন নারীকে মাতৃভাবে

সাধন, স্ত্রী, পতিতা নির্বিশেষে সকল নারীর প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন প্রভৃতি।অন্যদিকে বিবেকানন্দ মনে করতেন কোন আইনের মাধ্যমে নারী অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়, সমাজের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনেই তা সম্ভব।

রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ সমাজ তথা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল।এই ভাবাদর্শের প্রসারকে অনেকে 'আন্দোলন' রূপে অভিহিত করেন। তবে 'আন্দোল' প্রসঙ্গে বলা যায় শ্রীরামকৃষ্ণ বা বিবেকানন্দ কোন আন্দোলনের স্বঘোষিত নেতা ছিলেন না এমনকি কোন ছকেঁ বাধা কর্মসূচী তাঁরা নেননি। তাসত্ত্বেও তাঁদের বাণী ও আদর্শকে পাথেয় করে যে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়ে উঠেছিল তা একাধারে শাশ্বত ও বর্তমান যুগোপযোগী মূল্যবোধের সমন্বয় ঘটাতে চেয়েছিল। এর পাশাপাশি এই সংগঠনগুলি সমাজের প্রান্তিক নারী তথা অবহেলিত শিশুরা উপকৃত হয়েছিল। বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ যেমন মি: ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদ এবং ড: সুমিত সরকার ও ড: সালাহউদ্দিন আহমেদ রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দকে হিন্দু পুনরুজ্জীবনবাদী ও রক্ষণশীল বলে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা এই ভাবাদর্শকে ভারতীয় সমাজের হিন্দুধর্মবাদী প্রবণতা বা 'Dynamic force' হিসেবে দেখাতে চেয়েছেন, যদিও এর প্রত্যাশিত সাফল্য মেলেনি। বিবেকানন্দ হলেন সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি সমাজের সকল স্তরে সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য গৃহত্যাগ করেন। নাম্বুদ্রিরিপাদ বলেছেন বিবেকানন্দের উদ্দেশ্য ছিল মূলত হিন্দুধর্মের প্রচার কিন্তু পরিণতিতে দেখা যায় বিদেশী শাসক কর্তৃক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন ভারতীয় সংস্কৃতি বা আত্মাকে তিনি জাগিয়ে তোলেন।[৩৪] মুসলিম সমাজের বেশকিছু মানুষ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শে প্রভাবিত হন। যেমন মৌলবী দূরনেশ পীর এবং সৈয়দ ওয়াজিদ আলি যিনি রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলনকে 'mass movement' রূপে অভিহিত করেন এবং আরও বলেন- Quite distinct from the elitist movement of Rammohan Roy and Syed Ahmed Khan. বাস্তবিক রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শের সমাজসেবার বিষয়টি তাঁকে গভীরভাবে আকৃষ্ট করেছিল।

এছাড়া আরেকটি দিক দিয়ে এই রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শগত সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে সময় এই আদর্শের আর্বিভাব ঘটে ভারতে তখন সমাজ সংস্কারের প্রবাহ লক্ষ্য করা যায়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে দেখা যায় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি বা ভাবধারার অন্ধ অনুকরণ করেননি। পাশ্চাত্য পদ্ধতি ব্যতীত সম্পূর্ণ ঐতিহ্যগত বা দেশীয় পদ্ধতিতেও যে সমাজসংস্কার সম্ভব- তাঁরা মূলত এদিকটিকেই তুলে ধরেছেন। কোন ভাবাদর্শ তথা আন্দোলনের প্রসারের মাপকাঠিতে তাঁর গুরুত্ব বিচার করা যায় না। কোন পরিস্থিতিতে সেই ভাবাদর্শের উদ্ভব বা সমাজের তার প্রাসঙ্গিকতা ঠিক কতটা- তার ভিত্তিতে ঐতিহাসিক বা গবেষকগণ বিচার করে থাকেন। উনিশ শতকে দ্বিতীয়ার্ধে সমাজসংস্কারকগণ যখন প্রচলিত কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে নারীশিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তখন অন্যদিকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবাদর্শ তথা এর সাংগঠনিক আদর্শ নারীকে স্বনির্ভর ও সাবলম্বী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। এইপর্বের প্রতিষ্ঠানগুলি মূলত নারীদের উদ্যোগ ও প্রচেষ্টাতেই গড়ে উঠেছিল।তাই নারীজাতি সমস্যার সমাধান নারীরাই করবেন স্বামীজীর এই বাণীর প্রকৃত বাস্তবায়ন ঘটেছিল এর মাধ্যমেই।

গ্রন্থপঞ্জী:

১. বসু, স্বপন ও চৌধুরী ইন্দ্রজিৎ, উনিশ শতকে বাঙালী জীবন ও সংস্কৃতি, কলকাতা: পুস্তক বিপনী,
২. দাশগুপ্ত, সান্তনা, রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ জীবনদর্শন ও সমাজ দর্শন, কলকাতা: মানসী প্রেস, ১৯৯২
৩. গুপ্ত, মহেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ কথামৃত, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৮৩
৪. দেবী, দূর্গাপুরী, গৌরী মা. কলকাতা: সারদেশ্বরী আশ্রম, ১৯৩৯ (বঙ্গাব্দ ১৩৪৬)
৫. দাস, সুস্মিতা, বাংলার নারীমুক্তি আন্দোলন এবং শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী, কলকাতা: উদ্বোধন কার্যালয়, ১৯৯৯
৬. আনন্দবাজার পত্রিকা, ৮ই জানুয়ারী, ১৯৯৫
৭. নিবোধতে পত্রিকা, পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩৯৭
৮. বসু, শঙ্করীপ্রসাদ, নিবেদিতা লোকমাতা খন্ড, ১, কলকাতা: নবভারত পাবলিশার্স, ১৯৬৮

৯. স্বামী সারদানন্দ (সম্পাদিত). নিবেদিতা বালিকা বিদ্যালয়, বিবেকানন্দ পুরস্ত্রীশিক্ষা ও মাতৃমন্দিরের বার্ষিক বিবরণী, বাগবাজার: রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন
১০. নিবেদিতা বিদ্যালয় শতবর্ষ স্মারক পত্রিকা ১৮৯৮-১৯৯৮ সিস্টার নিবেদিতা গালর্স স্কুল: রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, ১৯৯৮
১১. প্রব্রাজিকা অশেষপ্রাণা, অনন্যা সুধীরা, দক্ষিনেশ্বর: রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, ২০১৩
১২. Ali, S, Wajid Bengalees of Tomorrow. Calcutta: Das Gupta Publisher, 1945
১৩. Forbes, Geraldine, Women in Modern India: New Cambridge
১৪. History of India. Vol. 4, Cambridge: Cambridge University Press, 1996
১৫. Mukherjee, Jayasri, Ramakrishna Vivekananda Movement: Impact of Indian Society and Politics (1893 - 1922). Calcutta:
১৬. Nambudripad, E.M.S. A History of Indian Freedom Struggle. New Delhi: Social Scientist Press, 1977
১৭. Pravrajika, Atmaprana, My India, My People - Sister Nivedita. New Delhi: Ramakrisna Sarada Mission, 1985.
১৮. Sister Nivedita, Hints on National Education. Vol.2, Calcutta: Udbodhan Office, 1923
১৯. Gambhirananda, Swami, History of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission.
২০. Calcutta: Advaita Ashrama, 1957